বাংলা ভাষার শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ এবং এর যাথার্থ্য বিচার

তারিক মনজুর*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা ভাষায় প্রযুক্ত হয় এমন কিছু বহুল ব্যবহৃত শব্দের প্রথাগত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ রূপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই আলোচনায়। ভাষা চূড়ান্তভাবে একটি প্রায়োগিক ব্যাপার। ফলে, ভাষার ব্যাকরণ কোনো শব্দকে 'অশুদ্ধ' বলতে পারে, কিন্তু বহুল প্রয়োগে তা 'শুদ্ধ' হয়ে যায়। তবে, ভাষা আদৌ অশুদ্ধ হতে পারে কি না এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। মুখের ভাষায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং লেখার ভাষাতেও একসময় এর প্রভাব পড়ে। এখানে, শব্দের যে রূপটি লিখিত বাংলার জন্য মান্য হতে পারে, তা নির্দেশ করা হয়েছে। ভাষা-গবেষণার দুটি প্রধান ধারা রয়েছে : ১. ভাষিক উপাদানের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এবং ২. ভাষা-বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ। মূলত শেষোক্ত ধারার প্রয়োগ করা হয়েছে এই গবেষণায়।]

'শুদ্ধ-অশুদ্ধ'র ধারণা চূড়ান্ত অর্থে মানসিক, প্রথাগত, 'ভদ্রসমাজ' কর্তৃক আরোপিত, কিংবা 'মানভাষা'র প্রতি একপেশে পক্ষাবলম্বন[১]। ভাষার ক্ষেত্রে 'শুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ' এ রকম বিশেষণ প্রয়োগ সবসময় যথার্থ হয় না। মনজুরে মওলা (১৯৯০ : প্রসঙ্গ-কথা) লিখেছেন, বানানের নিয়ম আছে, যদিও যে কোনো সজীব ভাষাতে নিয়মই সব নয়। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (২০০৭ : ১৬৮) বলেন, "ভাষাকে শত বন্ধনে আবদ্ধ এবং অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তিনী করিয়া রাখিলেও উহার স্বেচ্ছাচারিতা একেবারে বিদূরিত করিতে পারা যায় না"। মুনীর চৌধুরীর (১৯৭০ : ২৯) মতে, "শুদ্ধাশুদ্ধের ধারণা কখনোই পরিবর্তিত হয় না; অনেক অশুদ্ধ প্রয়োগ বর্তমানে অমার্জনীয় বলে বিবেচিত হয় না।" করুণাসিন্ধু দাস (২০০৫ : ১১) বলছেন, "শব্দের অশুদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না... আসলে শুদ্ধ-অশুদ্ধ-ভেদে শব্দের বিভাগটাই অযৌক্তিক"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২/১৬ : ৪৪০) নিজেও বলেছেন, "ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য।"

২. 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য

রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব লিখেছেন, চলিত বাংলায় এমন অসংখ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা লেখা পণ্ডিতদের মতে একটা 'অতি লজ্জাকর গর্হিত আচরণ'। এর কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করে তাঁরা দেখিয়েছেন বিষয়টা তত 'মারাত্মক অপরাধ' নয়। যেমন—

> আমরা যদি লিখি— 'অনাথিনী' ওঁরা চোখ রাঙিয়ে বলেন কথাটা 'অনাথা' হবে। তোমরা 'থিনী' লাগিয়ে আর 'অনাথার' অতিরিক্ত সর্ব্বনাশ কোরো না! আমরা 'গোবর' লিখলে ওঁরা সেখানে 'গোময়' লেপে দেন! আমরা 'অন্তর্ধান' হয়েছেন লিখলে ওঁরা সেখান থেকে 'অন্তর্হিত' হ'ন। আমরা 'আশ্চর্য্য' হয়েছেন লিখলে ওঁরা 'আশ্চর্য্যান্বিত' হয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। আমরা 'নির্দ্দোষী' লিখলে ওঁরা কিন্তু সেটা মোটেই 'নির্দ্দোষ' মনে করেন না। আমাদের 'নির্ধনী' তাঁদের কাছে 'নির্ধন'! আমাদের 'নৈরাশ' লিখতে দেখলে তাঁরা একেবারেই 'নিরাশ' হন। আমরা 'বিধর্ম্মী' লিখলে তাঁরা

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> আমাদের 'বিধর্ম্মী' মনে করেন! 'বিশেষ ভাবে' কিছু বলতে গেলে তাঁরা 'বিশিষ্টভাবে' সেটা বোঝেন না! আমাদের 'মহদুপকার'কে তাঁরা 'মহোপকার' বলে স্বীকার করেন না। আমরা 'সশঙ্কিত' লিখলে তাঁরা 'সশঙ্ক' বা 'শঙ্কিত' হ'য়ে ওঠেন। আমাদের 'সৌজন্যতা'কে তাঁরা মোটেই 'সৌজন্য' বা 'সুজনতা' বলে মানেন না। (রাধারাণী ও নরেন্দ্র, ২০০৭ : ৬৮–৬৯)

এরপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এসব ব্যাকরণের 'সাংস্কৃতিক বিধান' নিয়ে গোল না বাধিয়ে বরং 'বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে' তার স্বভাব-সংগত নিয়মগুলো উদ্ভাবন করা উচিত। রাজশেখর বসু (২০০৭ : ৬৯) যথার্থই বলেছিলেন– "কোনো ব্যক্তি বা বিদ্বৎ সঙ্ঘের ফরমাশে ভাষায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হ'তে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্ত্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে।"

অলোক রায় (২০০৫ : ৭৯) জানাচ্ছেন, ১৯১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র* থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে প্রশ্নে বলা হয়েছিল– Rewrite in chaste and elegant Bengali। অথচ তার আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে ডি.লিট উপাধি।

জন বিমস তাঁর বাংলা ব্যাকরণে অক্ষর ও শব্দের মৌখিক উচ্চারণ থেকে আরম্ভ করে চলিত প্রয়োগসমূহের নিয়ম আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলার লেখকেরা ভাষাকে অনাবশ্যকরূপে সংস্কৃত-অনুসারী করে তুলেছেন বলে তিনি আক্ষেপও করেছিলেন। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত (২০০৭ : ১৮৫) এই তথ্যের সূত্র ধরে লিখেছেন[৩], বাংলা ব্যাকরণ লিখতে বসে যাঁরা সংস্কৃতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তাঁরা ভাষার ওপর 'উপদ্রবে'র সৃষ্টি করছেন। প্রচলিত শব্দের মধ্যে যেগুলো তাঁদের কাছে অশুদ্ধ বলে মনে হয়, সেগুলোর এক দীর্ঘ তালিকা দিয়ে তাঁরা এর পাশে সংশোধিত শব্দের তালিকা দিয়ে থাকেন। এই শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচারের ফলে অনেক 'সম্পূর্ণ শুদ্ধ' বাংলা শব্দের যে দুর্দশা হয়, এর কিছু নমুনাও তিনি দিয়েছেন :

> সংস্কৃতপন্থিদের বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সকল শব্দের গোড়ায় 'স' সোদর, সবান্ধব প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত 'সহস্য সাদেশঃ' নয়, কিন্তু উত্তম, অত্যন্ত, বিশেষরূপে ইত্যাদি অর্থব্যঞ্জক, একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অব্যয় 'সু'র বিকৃতরূপ; অর্থাৎ 'সক্ষম' 'সশঙ্কিত' প্রকৃতপক্ষে 'সুক্ষম' (বিশেষরূপে ক্ষম বা সমর্থ)। 'সুশঙ্কিত' (বিলক্ষণ শঙ্কিত)। 'সঠিক' শব্দও এই জাতীয়। যোগেশবাবুও তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের 'ব্যাকরণ খণ্ডে' বক্ষ্যমাণ পদগুলি উক্তরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এবং ইহাতে দোষ ধরিবার কিছুই দেখিতে পাই না। সুপণ্ডিত, সুকঠিন প্রভৃতিতে সংস্কৃত 'সু' অবিকৃত আছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমরা দেখিতেছি, একই উপসর্গ অব্যয়ের দুটি রূপ, সংস্কৃত সু ও তাহার বাঙ্গালা অপভ্রংশ, পাশাপাশি রহিয়াছে। ...কেহ কেহ 'কায' 'ইতঃপূর্ব্বে,' 'ইতোমধ্যে' লিখিতে সুরুচি করিয়াছেন; এবং উপরে যে সকল আধুনিক ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি সে সব পুস্তকেও 'কাজ', 'ইতিপূর্ব্বে', 'ইতিমধ্যে' অশুদ্ধ শব্দের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু 'কাজ' প্রাকৃত 'কজ্জ' হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত কার্য্য হইতে নহে। সংস্কৃতের 'য' প্রাকৃতে প্রায়ই 'জ' হইয়াছে। উচ্চারণ-বৈষম্যই যে ইহার কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ...ইতিপূর্ব্বে, ইতিমধ্যে প্রভৃতি শব্দের 'ইতি' সংস্কৃত 'ইতঃ'র অপভ্রংশ ধরিয়া লইলে ক্ষতি কি? মোট কথা, আমরা পণ্ডিতি ধরনের ইতঃপূর্ব্বে, ইতোমধ্যে বলিতে বা লিখিতে পারি না। (কৃষ্ণবিহারী, ২০০৭ : ১৮৬–১৮৭)

সবশেষে কৃষ্ণবিহারী সিদ্ধান্ত করছেন, "মিছামিছি মৃত শব্দসমূহের 'ভূত'গুলোকে ডাকিয়া আনিয়া উপদ্রবের সৃষ্টি করায় লাভ কি?"

সুধাংশুশেখর তুঙ্গোর কামনা বাংলা ভাষা আরও সহজ, সাবলীল এবং শক্তিশালী হোক। কিন্তু তা হতে হবে স্বাভাবিকভাবে, কালের বিবর্তনের সঙ্গে। এক, একাধিক বা লক্ষ প্রতিভার যত্ন ও তৎপরতায় তা সম্ভব, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের খবরদারি ও নির্দেশের দ্বারা তা হতে পারে না। কারণ ভাষা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। অন্যদিকে, ব্যাকরণ-কর্তার কাজ ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা, শব্দকে জোড়বার বা ভাঙবার ক্ষমতা তাঁর নেই। (সুধাংশুশেখর, ২০০৫ : ১৮৪, ১৮৭)

৩. ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

ভাষার প্রচলিত রীতি থেকেই ব্যাকরণ তার নিয়ম খুঁজে নেয়। এই নিয়ম দীর্ঘদিন 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ'র মাপকাঠি হয়ে থাকে– যতদিন না নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা হয়। তবে ব্যাকরণের কাজ কিন্তু 'অনুশাসনে'র নয়। বরং ভাষার গতির সঙ্গে তাল রেখে তাকেও নিয়ম ও সূত্র পরিবর্তনের কাজ করে যেতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা ভাষার কিছু নিয়ম এখানে আলোচনা করা হবে। প্রতিক্ষেত্রে বন্ধনিতে সঠিক শব্দ-রূপ দেখানো হয়েছে।

৩.১ বিশেষ্য পদের দ্বিত্বজনিত অপপ্রয়োগ

মূল শব্দ যদি বিশেষ্য হয় এবং তার সাথে যদি আবারও বিশেষ্যবাচক তা, ত্ব প্রত্যয় যুক্ত করা হয় তবে অপপ্রয়োগজনিত ভুল হয়। যেমন : অপকর্ষতা (অপকর্ষ), অপ্রতুলতা (অপ্রতুল), উৎকর্ষতা (উৎকর্ষ), কৃচ্ছ্রতা (কৃচ্ছ্র), মৌনতা (মৌন), প্রসারতা (প্রসার), ঐক্যতা (ঐক্য), কার্পণ্যতা (কার্পণ্য), গাম্ভীর্যতা (গাম্ভীর্য), দৈন্যতা (দৈন্য/দীনতা), দারিদ্রতা (দারিদ্র্য/ দরিদ্রতা), বাহুল্যতা (বাহুল্য), মাধুর্যতা (মাধুর্য/মধুরতা), সখ্যতা (সখ্য), সৌজন্যতা (সৌজন্য)।

৩.২ বিশেষণ পদের দ্বিত্বজনিত অপপ্রয়োগ

বিশেষণ পদের সঙ্গে বিভ্রান্তিবশত পুনরায় বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করার ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সচেষ্টিত (চেষ্টিত/সচেষ্ট), মার্কিনী (মার্কিন), সবিনয়পূর্বক (সবিনয়ে/বিনয়পূর্বক), সলজ্জিত (সলজ্জ/লজ্জিত), সশঙ্কিত (সশঙ্ক/শঙ্কিত), সানন্দিত (সানন্দ/আনন্দিত)।

৩.৩ উৎকর্ষবাচক প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষার বহু গুণবাচক শব্দ আছে যেগুলোতে উৎকর্ষ বোঝাতে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ। এ জাতীয় শব্দের সঙ্গে অজ্ঞতাবশত কখনও কখনও 'তর' এবং 'তম' প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। একে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : কনিষ্ঠতম/কনিষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম/শ্রেষ্ঠতর, বলিষ্ঠতম/বলিষ্ঠতর– এই প্রয়োগগুলো ভুল।

৩.৪ সমার্থ শব্দের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষায় অসংখ্য শব্দ প্রচলিত আছে যেগুলোতে সমার্থবোধক একাধিক শব্দের প্রয়োগবাহুল্য লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় প্রয়োগ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। যেমন : অদ্যপিও

(অদ্যপি), আয়ত্তাধীন (আয়ত্ত/অধীন), বিবিধপ্রকার (বিবিধ), সমূলসহ (সমূলে/মূলসহ), সুস্বাগত (স্বাগত) ইত্যাদি। তবে চলতে পারে– অশ্রুজল/অশ্রু, কেবলমাত্র/কেবল/মাত্র, শুধুমাত্র/শুধু/মাত্র, সময়কাল/সময়/কাল, সুস্বাস্থ্য/স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

৩.৫ সন্ধিঘটিত অপপ্রয়োগ

সন্ধিঘটিত অপপ্রয়োগের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বানান ভুল হয়। যেমন : জ্যোতীন্দ্র (জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র), শরদেন্দু (শরৎ + ইন্দু = শরদিন্দু), জগৎবন্ধু (জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু), মনমোহন (মনঃ + মোহন = মনোমোহন), বাগেশ্বরী (বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী), দুরাবস্থা (দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা), তরুছায়া (তরুচ্ছায়া), মুখছবি (মুখচ্ছবি), উপরোক্ত (উপর্যুক্ত), উপর্যুপরি (উপর্যপরি), প্রাতঃরাশ (প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ) প্রভৃতি।

সন্ধিতে বিসর্গের পরে 'র' থাকলে বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়, অর্থাৎ বিসর্গের পূর্বে হ্রস্ব ই-কার থাকলে দীর্ঘ ঈ-কার এবং হ্রস্ব উ-কার থাকলে দীর্ঘ ঊ-কার হয়। যেমন, চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ, নিঃ + রক্ত = নীরক্ত, নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র, নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস প্রভৃতি।

৩.৬ স্ত্রীবাচক শব্দের অপপ্রয়োগ

স্ত্রীবাচক শব্দের অপপ্রয়োগের কারণে বানান ভুল হয়। যেমন : অভাগিনী (অভাগী), বন্দিনী (বন্দী), অর্ধাঙ্গিনী (অর্ধাঙ্গী), রজকিনী (রজকী), চাতকিনী (চাতকী), অনাথিনী (অনাথা), সুকেশিনী (সুকেশা), অপ্সরী (অপ্সরা), পিশাচিনী (পিশাচী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গা), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), দিগম্বরী (দিগম্বরা) প্রভৃতি।

৩.৭ সমাসঘটিত অপপ্রয়োগ

সমাসঘটিত অপপ্রয়োগের কারণে বানান ভুল হয়। যেমন : রাজাগণ (শুদ্ধ রাজগণ), সুকেশিনী (সুকেশা/সুকেশী), সুলোচনী (সুলোচনা), মৃগনয়নী (মৃগনয়না), সশঙ্কিত (শঙ্কিত/সশঙ্ক), নিষ্পাপী (নিষ্পাপ), নিরপরাধী (নিরপরাধ) প্রভৃতি।

৩.৮ প্রত্যয়জনিত অপপ্রয়োগ

প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের কারণে বানান ভুল হয়। যেমন : অধীনস্থ (হবে অধীন), আবশ্যকীয় (আবশ্যক), উদ্বেলিত (উদ্বেল), একত্রিত (একত্র), জ্ঞানমান (জ্ঞানবান), দৌরাত্ম (দৌরাত্ম্য), বাহ্যিক (বাহ্য), বিবাদমান (বিবদমান), বৈচিত্র (বৈচিত্র্য), সত্ত্বা (সত্তা), স্বত্ত্ব (স্বত্ব), স্বাতন্ত্র (স্বাতন্ত্র্য)।

অনেকে দ্বিত্ব বর্জনের বিধানকে য-ফলা বর্জনের বিধান ভেবে গোল পাকিয়ে বসেন এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে দরিদ্র, বিচিত্র, স্বতন্ত্র শব্দের বিশেষ্যরূপ দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য শব্দ থেকে য-ফলা বাদ দিয়ে দেন।

৩.৯ বচনের অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষায় বিশেষণ দ্বারা অসংখ্য শব্দের বহুত্ব নির্দেশ করা হয়। এ জাতীয় শব্দের পরে বহুবচনের বিভক্তি অথবা গণ, বৃন্দ ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয় না। যেমন : সকল পরীক্ষকগণ (সকল পরীক্ষক/ পরীক্ষকগণ), নতুন নতুন ছেলেগুলো (নতুন নতুন ছেলে/ নতুন ছেলেগুলো)।

৩.১০ চন্দ্রবিন্দুর যথাযথ প্রয়োগ

সাধারণত তৎসম শব্দের কথ্যরূপে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং অপভ্রংশের মাধ্যমে চন্দ্রবিন্দু হয়। যেমন– অঙ্কন থেকে আঁকা, শঙ্খ থেকে শাঁখা, গঞ্জিকা থেকে গাঁজা, কণ্টক থেকে কাঁটা, বণ্টন থেকে বাঁটা, ষণ্ড থেকে ষাঁড়, চন্দ্র থেকে চাঁদ, তন্ত্র থেকে তাঁত, দন্ত থেকে দাঁত, সন্তরণ থেকে সাঁতার, কম্পন থেকে কাঁপা, চম্পা থেকে চাঁপা, কংস থেকে কাঁসা, হংস থেকে হাঁস। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অনুনাসিক বর্ণ দ্বারা সংযুক্ত বর্ণ থাকলে কিংবা অনুস্বার থাকলে আধুনিক বাংলা ভাষায় এর পূর্বস্বর অনুনাসিক হয় (শহীদুল্লাহ্, ১৯৯৯ : ৮০)। যেমন, 'চন্দ্র' শব্দে 'ন' আছে; কিন্তু চাঁদ শব্দে পূর্ণ নাসিক্য ধ্বনি বর্জিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিক নিয়মেই স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়।

৪. কিছু প্রয়োগ-উদাহরণ

একই শব্দের বানানে নানা রকম রূপবৈচিত্র্য তৈরি হওয়ায় কারণেও শুদ্ধ-অশুদ্ধের তর্ক দেখা দিয়েছে। কিন্তু বানান-কাঠামো চূড়ান্ত-অর্থে রীতির ব্যাপার। এর সঙ্গে 'শুদ্ধতা'র মানদণ্ডকে যুক্ত করা ঠিক হবে না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের বানান-ভিন্নতার কারণে অর্থ-ভিন্নতাও দেখা দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সরলীকরণের প্রস্তাব করা হবে।

বাংলা বানানকে অধিকতর ব্যুৎপত্তিমূলক করা হবে, নাকি উচ্চারণ-অনুগতাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, কিংবা এর প্রচলিত মিশ্র-রূপকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে– এই তিন প্রসঙ্গের মীমাংসা করা সহজ নয়। তবে এইসঙ্গে মাথায় রাখা দরকার, বাংলা কোনো কোনো ধ্বনির বিপরীতে (ই/ঈ, উ/ঊ, ঋ/রি, জ/য, ণ/ন, শ/ষ/স) একাধিক বর্ণ রয়েছে। ধ্বনি-পার্থক্য বোঝানোর জন্য এইসব বর্ণ ব্যবহার করা যায় কি-না, বিশেষ করে বিদেশি শব্দের ধ্বনির যথাযথ প্রতিবর্ণীকরণের স্বার্থে বর্ণের বিকল্পগুলো রেখে দেওয়া যায় কি-না, সেটাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪.১ অয়ন

অর্থায়ন, বিশ্বায়ন, মূল্যায়ন– এসব শব্দের শেষে দন্ত্য-ন এবং গৃহায়ণ, চিত্রায়ণ, নগরায়ণ– এসব শব্দের শেষে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয় (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ১৫)। 'ণ' বর্ণ বাদ দেওয়া সম্ভব হলে 'অয়ন'-যুক্ত সব বানান এক রকম হবে। অবশ্য মূর্ধন্য-ণ বাদ না দিয়েও সমস্ত অয়ন-যুক্ত শব্দে দন্ত্য-ন ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ বিধি মনে রেখে বানান লেখার চেয়ে বানানের সরলীকরণ অধিকতর প্রত্যাশিত। তাছাড়া সব তৎসম শব্দে সংস্কৃত-বিধি মানা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৬ : ৪৪২) যথার্থই বলেছেন, "আমি এই সহজ কথাটা বুঝি যে প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণ-এর স্থান কোথাও নেই, নির্জীব ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে ঐ অক্ষরের বহুল আমদানি করে আপনাদের পাণ্ডিত্য কাকে সন্তুষ্ট করছে, বোপদেবকে না কাত্যায়নকে?"

৪.২ অধিকন্তু অর্থে 'ও'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কোনও', 'কখনও' প্রস্তাব করলেও রবীন্দ্রনাথ 'কোনো', 'কখনো' লেখার পক্ষপাতী (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৬ : ৪৩৭)। তবে অধিকন্তু অর্থে শব্দের শেষে ো-কার না দিয়ে 'ও' কার ব্যবহার করাই শ্রেয় হবে (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ২১; হায়াৎ, ২০০০ : ৩০)। অর্থাৎ আজও (আজো নয়), আরও (আরো নয়), কালও (কালো নয়) ব্যবহৃত হবে। এমনকি 'কখনো' নয়, 'কখনও'; 'কারো' নয়, 'কারও'; 'এখনো' নয়, 'এখনও' ব্যবহার করা যায়। তবে কথায় জোর দিতে শেষে 'ই' যুক্ত হলে ো-কার আনা যায় (যেমন : কখনোই, কোনোই)।

৪.৩ উদ্দেশ/উদ্দেশ্য

'উদ্দেশ' আর 'উদ্দেশ্য' দুটি আলাদা শব্দ (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ২৪; আলম, ২০১৪ : ৭০)। 'উদ্দেশ্য' শব্দের অর্থ– প্রতি, হদিস, দিকে। উদাহরণ :

ক. তার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হলো। (প্রতি, জন্য অর্থে)
খ. গত এক সপ্তাহ তার কোনো উদ্দেশ নেই। (হদিস অর্থে)
গ. নদী সাগরের উদ্দেশে ধেয়ে চলে। (দিকে অর্থে)

'উদ্দেশ্য' শব্দের অর্থ– অভিপ্রায়, লক্ষ্য, তাৎপর্য, প্রয়োজন। উদাহরণ :

ক. লেখাটি পড়ে লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা গেল না।
খ. লোকটা সুবিধের নয়, উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ করে না।

৪.৪ উল্লেখিত/উল্লিখিত

'উল্লেখিত' শব্দের অর্থ উল্লেখকৃত; আর উল্লিখিত (উৎ + লিখিত) শব্দের অর্থ ওপরে লিখিত (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ২৫)। যেমন:

ক) উল্লেখিত নিয়মগুলো অবশ্যপালনীয়। (উল্লেখ করা)
খ) উল্লিখিত নিয়মগুলো অবশ্যপালনীয়। (ওপরে লিখিত)

তাই 'উপরে উল্লিখিত' লেখা যাবে না; কিন্তু 'উপরে উল্লেখিত' বলা যাবে।

৪.৫ এমনই/এমনি

'এমনই' ও 'এমনি' আলাদা আলাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয় (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ২৫)। যেমন :

ক. লোকটা এমনই পাষণ্ড যে রোজ বউ পেটায়। (এতই, এ রকম অর্থে)
খ. পড়াশোনা এমনি এমনি হয় না। (শুধু শুধু অর্থে)
গ. এমনি এসেছি। (অকারণ অর্থে)
ঘ. এমনিতেই খাদ্যাভাব, তার ওপরে মহামারি। (একে তো অর্থে)

কোনো কোনো সময় বক্তা বা লেখকের অভিপ্রায়ই থাকে 'ই' আলাদা বা সংলগ্ন করে উচ্চারণ করার (অরুণ, ১৯৯৬ : ৫৬)। অতএব এমনই/এমনি বানান আলাদা রাখা যেতে পারে।

৪.৬ যখনই/যখনি, তখনই/তখনি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'যখনই', 'তখনই' প্রস্তাব করলেও রবীন্দ্রনাথ 'যখনি', 'তখনি' লেখার পক্ষপাতী (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৬ : ৪৩৭)। কবিতার জন্য সেটি প্রায়শ উপযুক্ত হলেও 'যখনই', 'তখনই' লেখা যুক্তিসংগত হবে।

৪.৭ কি/কী

'কী' আর 'কি'– এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো প্রস্তাব রাখেননি। বাংলা একাডেমি ও বাংলা আকাদেমির প্রস্তাবের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। তাঁরা বলছেন, যখন প্রশ্নমূলক সর্বনাম বা বিশেষণ তখন 'কী' লেখা হবে; যেক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র হ্যাঁ বা না-বাচক সেক্ষেত্রে ই-কার দিয়ে লেখা হবে। (মিতালী, ২০১০ : ২৪৫)

সুতপা ভট্টাচার্য (২০০৫ : ১৯৬) লিখছেন, "যে প্রশ্নেরই উত্তর হয় 'হ্যাঁ' হবে, না হয় 'না' হবে (Yes-no question), সেক্ষেত্রেই শুধু হ্রস্ব ই-কারযুক্ত 'কি' ব্যবহৃত হবে। আমাদের কথাবার্তা সবসময় এত সরল বুঝি? সব প্রশ্নেরই উত্তর চাওয়া হয়? 'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?'– এটি কি (Yes-no question)? 'আমি কি আর সেই আমি আছি?'– এ বাক্যটাই তো নঙর্থক, এতো Yes-no question করছে না মোটেই! তাহলে কি এসব জায়গায় 'কী' লিখতে হবে?"

মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৫) 'কি' ও 'কী' বানান প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এই দুটো শব্দকে আলাদা রাখার যে কি প্রয়োজন তা আমার মাথায় আসে না। আমরা তো শব্দ বলি না, বলি বাক্য। বাক্য থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু। বাক্যে এর অবস্থান থেকেই তো পাঠক ধরতে পারবেন, কোনটার কি মানে। আর উচ্চারণ বা বলাঘাতের জন্য দীর্ঘ ঈ-কারের প্রয়োজন হয় তবে অনেক শব্দকেই এমন হ্রস্ব-দীর্ঘে ভাগ করতে হবে। একটা 'কি' দিয়ে যদি কাজ চলে তবে অপর দীর্ঘ 'কী' আমদানি করার বোধ হয় প্রয়োজন হয় না।"

সলিমুল্লাহ খান 'কি' বানানের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলেছেন, বাংলায় 'কি' বানানের দ্বৈততার প্রয়োজন নেই (২০১০/১ : ১৫; ২০১০/২ : ৩৮)। কেননা, পরিস্থিতিই বুঝিয়ে দেয় 'কি' কোন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। বানানের সরলীকরণের স্বার্থে 'কি' বানান একটি রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তাছাড়া বর্ণমালা থেকে 'ঈ'-কে বাদ দিতে চাইলে ী-কার বর্জন করতে হবে।

অব্যয় 'কি' আর সর্বনাম/বিশেষণ 'কী'-কে আলাদা করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব (২০১২/১৬ : ৪৪৪–৪৪৫) ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বর্তমানে 'কি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় অব্যয় হিসেবে। আর 'কী' ব্যবহৃত হয় সর্বনাম ও বিশেষণ হিসেবে (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ২৫–২৬)। যেমন :

সে কি খেয়েছে? (উত্তর : হ্যাঁ/না)
সে কী খেয়েছে? (উত্তর : ভাত/ মাছ/অন্যকিছু)
কী সুন্দর পাখি! (অর্থাৎ, অনেক সুন্দর পাখি)

এখানে লক্ষণীয়, উদাহরণের প্রথম বাক্যে তিনটি রূপমূল উচ্চারণ করা হয় একইসঙ্গে। আর দ্বিতীয় বাক্যে তিনটি রূপমূল একসঙ্গে উচ্চারিত না হয়ে 'সে'-র পরে একটু থেমে 'কী' উচ্চারণ করা হয়। অর্থাৎ,

সে কি খেয়েছে?
সে | কী খেয়েছে?

ইংরেজিতেও এ রকম বাক্য আছে :

He looked | over the the fence. (সে বেড়ার ওপর দিকে তাকালো।)
He looked over | the the fence. (সে বেড়াকে অবজ্ঞা করলো।)

৪.৮ কোন/কোনো

কিছু শব্দের অন্ত্য অ-কার কখনও উচ্চারিত হয়, কখনও অনুচ্চারিত থাকে। উচ্চারিত অকার-কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ও' বা ও-কারযোগে দেখানো হয়; যেমন– কোনও, কোনো। আবার অনেক ক্ষেত্রে 'ও' বা ও-কার বর্জিত হয়; যেমন– কোন (উচ্চারণ 'কোনো')।

প্রশ্ন বোঝাতে 'কোন' (তুমি কোন দিকে যাবে?) এবং সাধারণ বর্ণনায় 'কোনো' (আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।) ব্যবহার করা যেতে পারে। এদের বানানভেদ থাকা উচিত। তবে 'কোন'-এর বদলে (হসন্ত-যুক্ত) 'কোন্' ব্যবহারের দরকার নেই। কারণ, 'কোনো' বোঝাতে 'কোন' ব্যবহার করলে অর্থদ্বৈততা এবং পড়ার অস্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হতে পারে।

৪.৯ একত্রীকরণ

কিছু শব্দের একত্রীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অর্থ-পার্থক্য রয়েছে (নীরেন্দ্রনাথ ১৯৯৫ : ১৫; মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ২৬,২৭,৩০)। যেমন :

১. কিনা/ কি না
সে কিনা গাড়ি কিনতে চায়। (কথার বিশেষ ভঙ্গি হিসেবে)
যাবে কি না বলো। (সংশয় বা প্রশ্ননির্দেশ)

২. তাই/ তা-ই
স্কুল বন্ধ; তাই ছেলেরা খুশি। (সংযোজক অব্যয়)
ছেলেটা যা দেখে, তা-ই কিনতে চায়। (সর্বনাম হিসেবে– সাধুরীতির 'তাহাই'-এর চলিতরূপ)

৩. যেই/ যে-ই
যেই তিনি এলেন, ছেলেরা সরে পড়ল। (যখন/ যেমন অর্থে)
যে-ই বলুক না কেন, আমি যাব না। (সর্বনাম হিসেবে)

৪.১০ লক্ষ/লক্ষ্য

প্রথম 'লক্ষ' ব্যবহৃত হয় সংখ্যা বা ক্রিয়া (দেখা/নজর) বোঝাতে। দ্বিতীয় 'লক্ষ্য' অর্থ– উদ্দেশ্য বা নিশানা (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ৩০–৩১; আলম, ২০১৪ : ৭৫)। আলাদা অর্থে প্রযুক্ত হয় বিধায় বানান পার্থক্য থাকতে পারে।

৪.১১ নিবে/নেবে, দিবে/দেবে

সাধুরীতির 'নিবে' ও 'দিবে' শব্দের চলিতরূপ হচ্ছে 'নেবে' ও 'দেবে'। সুতরাং 'নিবে' ও 'দিবে' শব্দের পরিবর্তে 'নেবে' ও 'দেবে' লিখতে হবে। (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ৩৩)

৪.১২ সংখ্যাশব্দ

সংখ্যাশব্দ আলাদা বসবে। যেমন : এক টাকা, দু বছর, আট মাইল। প্রমিত বাংলায় 'দুই' অর্থে দু ব্যবহার করা উচিত।

৪.১৩ সমাসবদ্ধ শব্দে হাইফেন

সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণভাবে হাইফেন বর্জন করা হয়। যেমন : পরানপ্রিয়, স্বাধীনতাবিরোধী, ছাত্রছাত্রী। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে হাইফেন রাখা দরকার।

১. সমাসবদ্ধ দ্বিতীয় পদের শুরুতে যদি স্বরবর্ণ থাকে। যেমন : ইচ্ছা-অনিচ্ছা, গণ-আন্দোলন।
২. মাঝখানে হাইফেন না দিলে যেখানে বিভ্রান্তির সুযোগ ঘটতে পারে বলে মনে হয়। যেমন : সরকারী বেসরকারী। (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ৩৯–৪১)

তবে বিছিন্ন থাকলেও তা সমাসবদ্ধ হতে পারে। যেমন : গরুর দুধ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি। ফলে, গরুর দুধ, অকূল পাথার ইত্যাদি শব্দ আলাদা লেখা উচিত।

৪.১৪ ধ্বন্যাত্মক/অনুকার শব্দ

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অনুকার দ্বিরুক্তগুলো একসঙ্গে লেখা যেতে পারে। যেমন : খাঁখাঁ, ভনভন, পটপট। *বাংলা একাডেমি* আধুনিক *বাংলা অভিধান*-এর (২০১৬) ভুক্তিতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ একসঙ্গে লেখা হয়েছে।

৪.১৫ দু/দূ

দুঃ/দুর্ উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে 'দু' ব্যবহৃত হবে। যেমন : জয়–দুর্জয়, নীতি–দুর্নীতি, সময়–দুঃসময়। আর দূরত্ব/দূরত্ববিষয়ক কিছু বোঝালে 'দূ' হবে। যেমন : দূরপাল্লা, দূরবর্তী, দূরালাপনী। (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ৩৩)।

৪.১৬ ভুতুড়ে

'ভুতুড়ে' শব্দটি এসেছে 'ভূত' থেকে। সেই হিসেবে এর বানান হওয়া উচিত 'ভূতুড়ে'। অভিধানে ভুতুরে/ভূতুড়ে/ভুতুড়ে– নানা রকম বানান দেখা যায়। প্রথম আলো বেশি প্রচলনের যুক্তিতে 'ভুতুড়ে' ব্যবহারের পক্ষপাতী (মাহবুবুল ও অন্যান্য, ২০১২ : ৪৯)। 'ভুতুড়ে' বানানটিই ভালো; এতে বানানে সরলতা আসে।

৪.১৭ অহ্ন

'অহ্ন' শব্দের আগে পূর্ব/অপর যুক্ত হয়ে মূর্ধন্য-ণ হয় (পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ)। আবার মধ্য/ছায়া যুক্ত হলে দন্ত্য-ন অপরিবর্তিত থাকে (মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন) (আলীম, ২০১১ : ৩০)। ঝামেলা এড়িয়ে সবক্ষেত্রে অপরিবর্তিতরূপে দন্ত্য-ন রাখা যেতে পারে।

৪.১৮ না/নি

না/নি/নেই/নয় নেতিবাচক শব্দগুলো আলাদা বসালেই হয়। 'নি' আলাদা বসবে কি-না, এই নিয়ে অবশ্য তর্ক রয়েছে। অনেকে একসঙ্গে লেখার পক্ষপাতী; আবার অনেকে পৃথক লেখার পক্ষপাতী (আলীম, ২০১১ : ৩০; হায়াৎ, ২০০০ : ৭৬)।

'নি' প্রসঙ্গে আকাদেমি বলেছেন, "পূর্বপদের ধ্বনিপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরবর্তী 'নি' যুক্ত এবং 'নি'-র কোনো স্বাধীন প্রয়োগ নেই।" এর বিপরীত মন্তব্য তুলে ধরে মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৪) বলছেন–

> 'নি' স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, ঠিক কথা, হয়ও না। যদি বলা হয় 'পূর্বপদের ধ্বনিপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তা যুক্ত, তবে তার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ তা ভাষিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা 'নি'-কে পূর্বপদের ধারাবাহিকতা থেকে অনায়াসেই বের করে আনতে পারি : যখন বলি *হয়ই নি*, বা *হয়ও নি* তখন কি তা পূর্বপদের ধারাবাহিকতার সঙ্গে থাকে, না বিশ্লিষ্ট হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যায় পূর্বপদ থেকে, আরো যথার্থভাবে বলা যায় পূর্ব ক্রিয়াপদ থেকে? আরো বলা যায়, সাধুতে বলি 'হয় নাই', তা কিন্তু কোনোমতেই পূর্বপদের ধারাবাহিকতার সঙ্গে জড়িত নয়, তা স্বাধীন শব্দ। নাই-ই তো রূপান্তরিত হয়েছে 'নি'-তে। বস্তুত, না এবং নি অন্বয়গতভাবে শর্তাধীন পদ (syntactically conditioned), দুটির ফাংশানই এক।

৪.১৯ সুধি/সুধী

'সুধী' শব্দে সবসময় দীর্ঘ ঈ-কার হয়। সুধীবৃন্দ, সুধীবর্গ ইত্যাদি বানানেও দীর্ঘ ঈ-কার হবে। এমনকি, সম্বোধনেও 'সুধী' বানানে হ্রস্ব ই-কার বসবে না। (আলীম, ২০১১ : ৩১; আলম, ২০১৪ : ৬৫)।

৪.২০ খ্রিস্ট/খ্রিষ্ট

খিস্ট/খ্রিষ্ট বানানে 'ষ্ট' যুক্তবর্ণটি দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংস্কৃত 'ষ্ট' আছে, 'স্ট' নেই বলে (আলম, ২০১৪ : ৬৮) এই বানান কিছুদিন আগে পর্যন্ত চলেছে। পরবর্তীকালে ইংরেজি st-এর জন্য 'স্ট' ব্যবহারের কথা বলা হলে খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো– Christ ও Christian থেকে বাংলায় আত্তীকৃত বলে এবং উচ্চারণগত কারণে 'খ্রিষ্ট' ও 'খ্রিষ্টাব্দ' শব্দে 'ষ্ট' দিয়ে লেখা হবে। এ নিয়মে খ্রিষ্টপূর্ব, খ্রিষ্টান ও খ্রিষ্টীয় লেখা হলো। সম্প্রতি প্রমিত বাংলা ব্যাকরণে আবার খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ লেখা হচ্ছে। এইসব দ্বিধান্বিত ক্ষেত্রে তো বটেই, সবক্ষেত্রেই, মূর্ধন্য-ষ বর্জন করা যায়।

৪.২১ তৈরি/তৈরী

ক্রিয়া এবং বিশেষণ পদের জন্য তৈরি/তৈরী বানানে ভিন্নতা রয়েছে (আলম, ২০১৪ : ৭১)। উদাহরণ :

> যেভাবে বললাম, সেভাবে এটা তৈরি করে নিয়ে এসো।
> আহা, এত কষ্টের তৈরী জিনিসটা এভাবে নষ্ট হলো?

এক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার বর্জন করে বানানের একটি রূপই ('তৈরি') রাখতে হবে। কারণ ভাষার সাধারণ ব্যবহারকারী ক্রিয়া বা বিশেষণ হিসেবে বিবেচনা করে পদের প্রয়োগ করেন না।

৪.২২ ভারি/ভারী

"ছেলেটা তো ভারি দুষ্টু" কিংবা "বোঝাটা বেশ ভারী"– এই দুই বাক্যে দুই অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম 'ভারি' ব্যবহৃত হয় অতি/অত্যন্ত/দারুণ অর্থে। আর দ্বিতীয় 'ভারী' ব্যবহৃত হয় গুরুভার/ওজনদার/দায়িত্বপূর্ণ হিসেবে। একটা 'ভারি' রাখাই ভালো। কারণ পরিপ্রেক্ষিতই এর অর্থ করে নেবে। বানান কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

৪.২৩ খুশি/খুশী

অনেকে ব্যবহারের ভিন্নতা বোঝানোর জন্য কিংবা বিশেষ্য/বিশেষণকে আলাদা করার জন্য দু রকম প্রত্যয়ান্ত বানানের কথা বলেছেন। এ সবই অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করা মাত্র। অরুণ সেন (১৯৯৬ : ৪৭) যথার্থই বলেছেন, এর কোনো প্রয়োজন নেই।

সুতপা ভট্টাচার্য অবশ্য লিখেছেন–

> 'সহজ পাঠ'-এ 'খুশি' আর 'খুশী' দু রকম বানান যে আছে, সে তো বিশেষণ হলে দীর্ঘ 'ঈ'-কার হবার তৎকালীন নিয়ম মেনেই। দেখা যাচ্ছে, বিশেষ্য 'খুশি'র জোর বেশি, বিশেষণ 'খুশী'কে অল্পজনই জানে। তাই পণ্ডিত অধ্যাপকরাও 'খুশি'টাই দেখতে চান, বিশেষণ হিসেবেও। 'খুশি' আর 'খুশী'র তফাৎ সম্ভবত আকাদেমি করতে চান না, তাহলে 'কী' আর 'কি'র তফাৎ কেন রাখতে চান? (সুতপা, ২০০৫ : ১৯৫)

৪.২৪ ও-কার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটি অযথা ও-কার দেওয়ার বিরোধী। তবে অর্থগ্রহণের সুবিধার জন্য বিকল্পে ও-কার দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। যেমন– কাল, কালো। বাংলা একাডেমি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন–অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, অব্যয় এবং অর্থ অনুধাবনে বিভ্রান্তিকর কিছু শব্দে) বিকল্প ছাড়া ও-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী। বাংলা একাডেমির *আধুনিক বাংলা অভিধানে* (২০১৬) দেখা যায়, সংখ্যাশব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কোথায় কোথায় ও-কার দেওয়া উচিত এর একটি তালিকা তুলে ধরেছেন।

ও-কার রাখা যেতে পারে– ভাল/ভালো, মত/মতো, কাল/কালো ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও অর্থপার্থক্য বোঝানোর জন্য। সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত হবে; যেমন– এগারো,

বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো। এমনকি, ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার থাকলে উচ্চারণেও সুবিধা হয়; যেমন– হলো, হতো, এসো, করলো, করবো ইত্যাদি।

৪.২৫ মত/মতো, ভাল/ভালো, কাল/কালো, ছোট/ছোটো

একই বানানের দুটি ভিন্ন অর্থের শব্দের মধ্যে গোলমাল হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে বলা হয় 'মত/মতো', 'ভাল/ভালো', 'কাল/কালো', 'ছোট/ছোটো', 'হত/হতো', 'হল/হলো' ইত্যাদির কথা। আপাতদৃষ্টিতে বেশ যুক্তিসংগত, কিন্তু এই শব্দগুলো এতই ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ার কথা যে এদের মধ্যে গোলমাল কষ্টকল্পনা মাত্র (অরুণ, ১৯৯৬ : ৫০)। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৪১৩ : ৫০) বলেছেন, "বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি বাক্যও চোখে পড়ে নি যেখানে 'ভাল' শব্দের অর্থগ্রহণে বাধা পেয়েছি।"

ভারতবর্ষের ভাদ্র ১৩৩৮ (১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ) সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাংলা শব্দ ও বানান' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয় (মিতালী, ২০১০ : ১১৫)। অ-কারান্ত বিশেষণের 'অ'-কার স্থলে ও-কার লেখার যে প্রবণতা রয়েছে তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর প্রস্তাব কোথাও অ-কারান্ত করতে হলে অক্ষরের পাশে বিন্দু বসানো চলে। যেমন, ভালো নয়, ভাল.। 'মত' এবং 'মতো'-র বানান-পার্থক্য রাখার জন্য ও-কার না দিয়ে প্রয়োজনে হসচিহ্ন ব্যবহার করতে বলছেন তিনি (অর্থাৎ যথাক্রমে 'মত্' এবং 'মত')।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কালো' (রং বোঝাতে), 'ভালো' (উত্তম অর্থে) ইত্যাদি বানানের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, "কালো উচ্চারণের ওকার প্রাকৃত বাংলার একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। তত্ত্বটি এই যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ এই ভাষায় প্রায়ই স্বরান্ত হয়ে থাকে" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৬ : ৪৩৬)। উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে দু রকম বানানকে আলাদা রাখা উচিত।

৪.২৬ উদ্যোগ/ উদ্‌যোগ

দ্ ও য-ফলার যখন সংযোগ ঘটবে, তখন উচ্চারণ-অনুসারে তা ভাঙা হবে বা যুক্ত হবে। যেমন : উদ্‌যাপন, কিন্তু উদ্যোগ (অরুণ, ১৯৯৬ : ৭১)। এই রীতি রবীন্দ্রনাথও প্রয়োগ করেছেন। এটি মান্য করা যেতে পারে।

৪.২৭ আর্ষ প্রয়োগ

কোনো কোনো সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে বৈয়াকরণিক দিক থেকে গ্রাহ্য না হলেও প্রখ্যাত লেখক বা ভাষাবিদদের দ্বারা বহুলভাবে প্রচলিত হওয়ার কারণে সেই 'ভুল' শব্দ গৃহীত হয়ে গেছে। তা ব্যবহৃত হতে বাধা নেই। যেমন : ইতিমধ্যে, উপরোক্ত, সৃজন ইত্যাদি (অরুণ, ১৯৯৬ : ৭১)। দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রের অংশবিশেষ এক্ষেত্রে যুক্তি হতে পারে : "অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়ে এসেছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার ওকালতি উপলক্ষে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে– অর্থাৎ এখন ঐ 'ইতিমধ্যে' শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৬ : ৪৩৯)

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' সম্পর্কে দীর্ঘদিন থেকে অনেক আলোচনা হলেও এর শতভাগ মীমাংসা হয়নি এবং না-হওয়ারই কথা। কারণ, ভাষাভাষী ব্যাকরণের সূত্র দেখে কথা

বলেন না। তাছাড়া কোন শব্দ তদ্ভব, কোনটা তৎসম এ সম্পর্কেও তাঁদের জানা থাকে না। পাণিনি সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন দিক সংস্কার করেছেন ঠিকই, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। এই লেখায় বিভিন্ন বৈয়াকরণের ব্যাকরণ অনুসরণ করে একটা রূপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আমাদের মেনে নিতে হবে, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভাষার 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' রূপ নির্ধারিত হয়। ব্যাকরণের কাজ ভাষার বর্ণনা করা ও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা; 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' নির্ণয়ের দায়িত্ব এর নয়। ভাষার গতিপ্রবাহের সঙ্গে মিল রেখে ব্যাকরণের 'শাসন'কে কখনও কখনও শিথিল করতে হয়। এই পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনায় বিপ্লবাত্মক কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি; মান্য রীতির সঙ্গে যুক্তির সম্মিলন ঘটিয়ে কিছু প্রস্তাবকে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে মাত্র।

টীকা

১. রিদওয়ান আলী খান (২০১২) এ বিষয়ে বিস্তৃত মত প্রকাশ করেছেন 'বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি ও সংস্কার' প্রবন্ধে।

২. মানসী ও মর্ম্মবাণী : মাঘ ১৩২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সহায়কপঞ্জি

অরুণ সেন (১৯৯৬)। *বানানের অভিধান (বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন : একটি প্রস্তাব)*। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, কলকাতা।

অলোক রায় (২০০৫)। 'সুয়োরানীর নির্বাসন'। *ভাষাভাবনা*। সম্পাদক : তুষারকান্তি মহাপাত্র। অবভাস, কলকাতা।

আব্দুল আলীম (২০১১)। *বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা*। গতিধারা, ঢাকা।

করুণাসিন্ধু দাস (২০০৫)। *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*। সদেশ, কলকাতা।

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত (২০০৭)। 'ভাষা সম্বন্ধে দু'একটি কথা'। *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*। সংকলক : দীপঙ্কর ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

জামিল চৌধুরী (২০১৬)। *আধুনিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (২০০৭)। 'পল্লীভাষা ও সাহিত্য'। *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*। সংকলক : দীপঙ্কর ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯৯১)। *বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (২০০৫)। 'বানান সংস্কারের চিন্তা অবান্তর নয়'। *ভাষাভাবনা*। সম্পাদক : তুষারকান্তি মহাপাত্র। অবভাস, কলকাতা।

মনজুরে মওলা (১৯৯০)। *বানান ও উচ্চারণ*। জামিল চৌধুরী কর্তৃক রচিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মাহবুবুল আলম (২০১১)। *বাংলা বানান ও ভাষারীতি*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

মাহবুবুল হক, সাজ্জাদ শরিফ ও অন্যান্য *সম্পা.* (২০১২)। *প্রথম আলো ভাষারীতি*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০)। *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*। পারুল প্রকাশনী, কলকাতা।

মুনীর চৌধুরী (১৯৭০)। *বাঙলা গদ্যরীতি*। কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৯)। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মৃণাল নাথ (২০০৫)। 'সাম্প্রতিক বানান সংস্কার : একটি সমীক্ষা'। *ভাষাভাবনা*। সম্পাদক : তুষারকান্তি মহাপাত্র। অবভাস, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১–১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (২৫ খণ্ড)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রাজশেখর বসু (২০০৭)। 'বাংলা বানানের নিয়ম'। *বানান বিতর্ক*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব (২০০৭)। 'চলিত ভাষার সংস্কার'। *বানান বিতর্ক*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

সলিমুল্লাহ খান (২০১০/১)। *নতুনধারা*, ৭ম সংখ্যা ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, ১৫ মে ২০১০। সম্পাদক : নাঈমুল ইসলাম খান। ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান (২০১০/২)। *নতুনধারা*, ৮ম সংখ্যা ১ আষাঢ় ১৪১৭, ১৫ জুন ২০১০। সম্পাদক : নাঈমুল ইসলাম খান। ঢাকা।

সুতপা ভট্টাচার্য (২০০৫)। 'বাংলা পঠন-পাঠন-এর নতুন নিয়মকানুন পুরোনো মাস্টারের চোখে'। *ভাষাভাবনা*। সম্পাদক : তুষারকান্তি মহাপাত্র। অবভাস, কলকাতা।

সুধাংশুশেখর তুঙ্গ (২০০৫)। 'বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ'। *ভাষাভাবনা*। সম্পাদক : তুষারকান্তি মহাপাত্র। অবভাস, কলকাতা।

হায়াৎ মামুদ (২০০০)। *বাংলা লেখার নিয়মকানুন*। প্রতীক, ঢাকা।